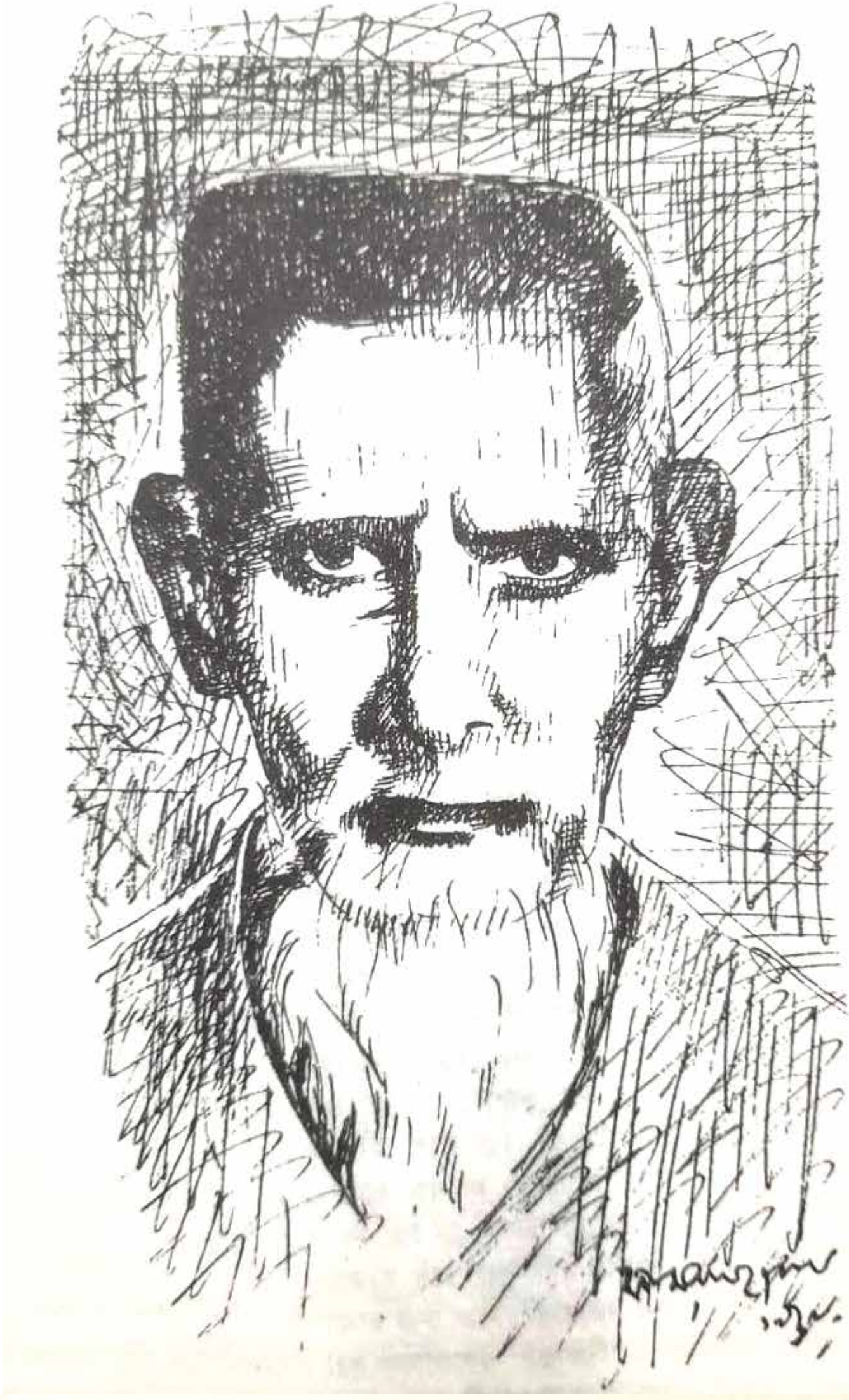

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ
দেশ-কাল-সমাজ ও জীবন

ড. আহমদ শরীফ

১. দেশ-কাল-সমাজ

১. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মন-মানসের সম্যক পরিচিতির ও তাঁর সাধনার এবং অবদানের যৌক্তিক মূল্যায়নের জন্যে তাঁর জন্ম ও জীবন পরিসরের স্বদেশ, স্বকাল ও স্বসমাজ প্রতিবেশ সম্বন্ধে আমাদের অন্তত একটা স্থূল ধারণা থাকা আবশ্যিক।

উনিশ শতকের শেষ পাদেই আবদুল করিমের শৈশব-বাল্যের অবসান এবং যৌবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহ্যধারক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বৈদ্যশ্রেণির শিক্ষিত হিন্দুরাও তখন আরো প্রবলভাবে ও বিপুল সংখ্যায় দেশের অর্থ সম্পদ শিক্ষা প্রশাসন প্রভৃতির ধারক ও নিয়ামক। বিদেশী তুর্কী-মুঘল শাসনকালেও এরাই ছিল গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে বিচারকার্য ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজকর, প্রশাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থ-সম্পদ, বিধি-বিধান প্রভৃতির প্রকৃত নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক। চাকলায়, কশবায়, চৌকিতে, তকসীমে, মহলে, থানায়, বন্দরে ও শহরে অবশ্য সেনানী শাসক-প্রশাসক ছিলেন শাসকগোষ্ঠির বিদেশাগত বিভাষীরা। এঁরা ছিলেন পরবর্তীকালের ইংরেজ প্রশাসক ম্যাজিস্ট্রেট-কালেকটর-জজদের মতোই। ব্যবসায়ী পর্তুগীজ-ইংরেজ-ফরাসীদের বেণে-ফড়ে-মুৎসুদ্দী হিসেবে হিন্দুরা গোড়া থেকেই ছিল য়ুরোপীয়দের সহযোগী। কাজেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী পেয়েই এদের সাহায্য-সহযোগিতায় রাজস্ব-প্রশাসন চালাতে থাকে। এ কারণেই প্রাশাসনিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি নির্বাচিত ও চালু হবার আগেই হিন্দুরা ইংরেজি শিখতে থাকে। কোলকাতায় এ যুগের কিণ্ডারগার্টেনের মতোই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজি শেখা-শেখানোর জন্যে ঘরোয়া বিদ্যালয় গড়ে ওঠে, যার পরিণামে ১৮১৭ সনেই হিন্দু কলেজ এবং বিশপস কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কোলকাতায় এ সময়ে দেশজ মুসলিম ছিল গোড়া থেকেই অনুপস্থিত। তাই বঞ্চিত রইল নতুন যুগের প্রসাদ থেকে। কোলকাতা ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। ১৭৬৫ সন থেকে ইংরেজ সহকারী-সহযোগী হিসেবে কোলকাতা হল হিন্দুরই শহর-বন্দর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবহুল মুদ্রাবিনিময়-নির্ভর প্রতীচ্য শিক্ষা-সংস্কৃতি-ফ্যাক্টরী ধন্য কোলকাতাতেই নতুন যুগের সূচনা ও দ্রুত প্রসার বিকাশ ঘটে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুদ্রানির্ভর নতুন ভূমিরাজস্ব সংগ্রহনীতি, নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি, স্বদেশে সম্পদপাচারনীতি এবং স্বদেশী পণ্যের বাজারদখলনীতি প্রভৃতি মুখ্যত পণ্য-বিনিময় ভিত্তিক ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী গঠিত স্বনির্ভর গ্রামীণ সমাজের ভিত আকস্মিকভাবে ভেঙে দেয়। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য ও নতুন

জমিদার-তালুকদার-মুৎসুদ্দী-দেওয়ান-গোমস্তা-মহাজন আর চাকুরে শ্রেণি ছাড়া অন্য সর্বপ্রকার হিন্দু-মুসলিম পেশাজীবীর ও চাষী-মজুরের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে দেখা দেয় অসনে-বসনে-নিবাসে-নিদানে চির অনিশ্চয়তার, অনিরাপত্তার ও অসচ্ছলতার অবস্থা এবং ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা-খরা কবলিত জীবনে বেড়ে যায় রোগ-মারী-অপুষ্টি-অনাহারজনিত মৃত্যুর হার।

২. সাধারণভাবে এখন এ তথ্য স্বীকৃত যে দেশজ মুসলমানদের প্রায় সবাই নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির হিন্দু-বৌদ্ধের বংশধর। শিল্পবিপ্লবের মতো কিছু এদেশে তখনো ঘটেনি বলে দীক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে পেশাবদল হয়েছে ক্বচিৎ কারো কখনো। তাই বিদেশাগত প্রশাসকগোষ্ঠির কাছে তারা ছিল অবজ্ঞেয় আতরাফ-আজলাফ নিম্নবৃত্তিজীবী জুলহা নিকেরী মুলুঙ্গী কাগজী কৈবর্ত প্রামাণিক চাষী গৃহস্থ মজুর প্রভৃতি; যদিও এদের মধ্যে থেকেই ক্রমে কাজী, উকিল, মুনশী-মোল্লা মৌলবী-মুয়াজ্জিন-হেকিম হতে থাকেন বটে, তবু শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল নগণ্য, শিক্ষিত লোক ছিল বিরল। আবার তাদের মাদ্রাসাশিক্ষায় ফারসী-আরবী ভাষাই ছিল বাহন [পরে উর্দুও] প্রায় ১৯৩০ সন অবধি। বাঙলার আদর-কদর ছিল না বলে মাদ্রাসায় বাঙলা হরফ শেখানোও হতো না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তাদের বাঙালা বই পড়ার সাধ মেটানোর জন্যে এদেরই উদ্যোগে চট্টগ্রামে উনিশ শতকে আরবী হরফে কিছু পুথির প্রতিলিপি তৈরীর রেওয়াজও চালু হয়েছিল।*

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসিত সুবেহ বাঙলায় মুসলিমরা সৈন্যবিভাগে চাকরিচ্যুত হয়ে উত্তর ভারতের দিকে চলে যায়। আত্মমর্যাদায় বাধে বলে অন্য কোন বেসামরিক চাকরির তদবীরও করে নি। নওয়াবীর অবসানে মুর্শিদাবাদ শহরে উর্দুভাষী মুসলিম বৃত্তিজীবী, ব্যবসায়ী এবং উকিলরা কোলকাতায় এল বটে, কিন্তু কোলকাতার জীবিকাক্ষেত্র গোড়া থেকেই হিন্দু-অধিকারে থাকায় এবং সেখানে বাঙলাভাষী মুসলিমের বিরলতার দরুন সহায়তার আশ্বাসের অভাবে দেশজ মুসলিমরা কোলকাতায় বহু বহু কাল অনুপস্থিতই ছিল। অথচ ইংরেজি শিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশ বহুকাল সীমিত ছিল নগর-বন্দর কোলকাতাতেই। ফলে ইংরেজি শিক্ষার আলো বাঙালী মুসলিম ঘরে পৌঁছতে উনিশ শতকের শেষপাদ এসে গেল।

---

*কন হরফে কন লফজন বুঝিএ অর্থ/বাঙ্গালা অক্ষর হেরি আরবীর পুস্ত। নস্‌রুল্লাহ খোন্দকারের শরীয়তনামার লিপিকর আলিজানের উক্তি। অন্য পুথিতেও এ সংবাদ মেলে।

ওয়াহাবীরা ১৮২২ সন অবধি ব্রিটিশবিদ্বেষী ছিল না। ইংরেজি প্রশাসনের বাহনরূপে গৃহীত হয় ১৮৩৮ সনে। অতএব ১৮৩৮-৬০ সন অবধি নিরক্ষর ওয়াহাবী ও ফরায়েজী সমর্থকদের মধ্যে ইংরেজ ও ইংরেজি বিদ্বেষ থাকলেও ১৮৬০ সনের পর থেকে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রভাবে সাধারণভাবে মুসলিম-মনে ব্রিটিশপ্রীতি জাগতে থাকে। কাজেই দেশজ মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষার বিলম্বিত প্রসারের কারণ তাদের অধিকাংশের মধ্যে সাক্ষরতার বা শিক্ষার ঐতিহ্যের অভাব, কোলকাতায় তাদের স্বধর্মীজ্ঞাতির অনুপস্থিতি এবং গাঁয়ে-গঞ্জে ইংরেজি বিদ্যালয়ের বিরলতা।

১৮৩৮ সনে কাজী কমিশনারের পদ উঠে গেল, মুনসেফের পদ সৃষ্টি হল দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্যে। তার আগে ১৮৩২ সন থেকেই ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হচ্ছিল। ইংরেজি শিক্ষার অভাবে দেশজ মুসলিমেরা এসব পদ থেকে বঞ্চিত হল এবং ১৮৬০ সনের দিকে আদালত ইংরেজিজানা মুনসেফ-ম্যাজিস্ট্রেট-উকিল আকীর্ণ হওয়ায় শুধু ফারসীজানা মুনসী উকিলের প্রয়োজন ফুরোল। এখন থেকে বিদ্যালয় ও অফিস-আদালত হিন্দু অফিসারের, হাকিমের, কেরানীর, উকিলের ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পুরো দখলে চলে গেল। এভাবে জমিদার-মহাজন-ডাক্তার-উকিল-শিক্ষক-ছাত্র-দোকানদার-ব্যবসাদার-চাকুরে এক কথায় ধনী-মানী শিক্ষিত চাকুরে মাত্রই হিন্দু এবং দরিদ্র চাষী কুলি মজুর মাঝি-মাল্লা ও তুচ্ছ বৃত্তিজীবী (বৃত্তিজীবী নিম্ন বর্ণের হিন্দু ছাড়া) মাত্রই যেন নিরক্ষর মুসলিম এমনি একটা প্রায় বাস্তব ধারণা ও অবস্থা গড়ে উঠল।

তুর্কী-মুঘল আমলের অফিস এবং শিক্ষিত বিরল নিস্তরঙ্গ ও পরিবর্তনরিক্ত বৃত্তিজীবীর গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতি দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠল। এ নব জাগরণে ও জীবনে নির্জিত মুসলিম সর্বত্র অনুপস্থিত। তখন মুনশী-মোল্লা-মুয়াজ্জিন-মৌলবীরাও হিন্দুর মোকাবেলায় অজ্ঞতায় নিরক্ষরতায় ও হীনমন্যতায় ভুগছে। তখন উদ্যমশীল উচ্চাভিলাষী মুসলিম মাত্রই হিন্দুর অনুকারক। তাদের পাবলিক ও অফিসী পোশাক তখন ধুতি-পাঞ্জাবী-চাদর। বৈষয়িক কাজ কারবারও হিন্দু-নির্ভর। মুসলিমমাত্রই আত্মবিস্মৃত। কোলকাতা শহরে তাদের নেতাও বিদেশী উর্দুভাষী এবং তাদের সঙ্গে সর্বপ্রকার শৈক্ষিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিরহী। সে সব শহুরে শিক্ষিত উর্দুভাষী নেতারা আত্মবিস্মৃত অজ্ঞ বিভ্রান্ত নবশিক্ষিত দেশজ মুসলিমদের মন থেকে স্বদেশ ও স্বভাষা চেতনা মুছে দেয়ার চেষ্টায় বাঙলাদেশ ও বাঙলাভাষা হিন্দুর বলেই প্রচারণা চালায়। এবং স্বল্প সংখ্যায় ইংরেজি শিক্ষিত কিন্তু প্রজন্মক্রমে দেশজ বাঙালী মুসলিম মনে স্বধর্মীয় জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তাদেরকে স্বদেশে প্রবাসীমনস্ক করে তোলে এবং সর্বক্ষেত্রে প্রাগ্রসর ধনী মানী শিক্ষিত প্রশাসক, চিকিৎসক, শিক্ষক হিন্দুদেরকে মুসলিমদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগী শাসক শোষক পীড়ক বলে ভাবতে শেখায়।

কোলকাতায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ফলে লিখিত আধুনিক বাঙলায় হিন্দু রচিত বইপত্রেও কেবল হিন্দুর লেখা ও হিন্দুর কথা এবং মুসলিমের প্রতি অবজ্ঞা, ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ পেতে দেখে দেশজ মুসলিমরাও ভাবল বুঝি বাঙলা হিন্দুর ভাষা এবং বাঙলাদেশের সব ইতিবৃত্ত ও ঐতিহ্য-সংস্কৃতিও বুঝি হিন্দুর। নির্জিত মুসলিমদের এ বুঝি সত্যই বিদেশ বিভূঁই। স্বদেশে ঐতিহ্য-শিকড়ের সন্ধান না পেয়ে আধুনিককালের সাধারণ শিক্ষিতরা, মুসলিমরা এবং কবি-সাহিত্যিকরা দেশ-কাল জাত-বর্ণ-রাষ্ট্র-ভাষা-সংস্কৃতি ও অবস্থান নিরপেক্ষ স্বধর্মীয় ভ্রাতৃত্বে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিন্নতায় আর আদর্শিক ঐক্যে এবং লক্ষ্যে ও অভিন্ন পরিণামে আস্থাবান হয়ে যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে ঐতিহ্যের ও শিকড়ের বিষয় সন্ধানে সাধারণভাবে পনেরো শতকের পূর্বেকার আরবে-ইরানে-স্পেনে ও মধ্য এশিয়ায় সোৎসাহে মানস পরিভ্রমণ করেছেন নজরুল ইসলামের কাল অবধি। কারো কারো লেখার কিছু কিছু বিষয় দেশীয় হলেও অভিন্ন মূল রসুনের মতো কাল ও স্থাননিরপেক্ষ বিশ্বমুসলিম অভিন্ন সত্তা ও স্বার্থচেতনা ছিল প্রবলভাবে প্রবহমান।

২. জন্ম, বংশ, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান

এমনি দৈশিক, সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক প্রতিবেশে ১২৩৩ মঘী সনে বা ১৭৯৩ শকাব্দে পঁচিশে আশ্বিন মঙ্গলবারে সূর্যোদয়ের একঘণ্টা ৩৬ মিনিট ক্ষণে আবদুল করিমের জন্ম হয় [১৮৭১ সনে ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবারে][১] যিনি কর্ণফুলী নদীর পূর্বতীর থেকে টেকনাফ অবধি প্রাক্তন চট্টগ্রাম জিলার অর্ধাংশে ১৮৯৩ সনে একমাত্র এন্ট্রান্স পাশ মুসলিম এবং ১৮৯৫ সন অবধি সে অঞ্চলের একমাত্র এফ-এ পড়ুয়া ছাত্র।

বর্তমান পটিয়া উপজিলার পটিয়ার পাশের সুচক্রদণ্ডী গ্রামের এক উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে আবদুল করিমের জন্ম। তাঁর পিতৃব্য মুনশী আইনউদ্দীন ছিলেন রাশভারী জেদী মানুষ। তিনি জজকোর্টে নকলনবীশ ছিলেন। মধ্য বয়সে চাকরিচ্যুতও হয়েছিলেন সেরেস্তাদারের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহারজাত অবাধ্যতার দরুন। ওই জেদের জন্যেই মুখ্যত তিনি নানা ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং জমিদারী তালুক ও বহু খাস জমি হারিয়ে পরিবারকে ক্রমে দারিদ্র্য কবলিত করেন।[২] এর ফলে যৌবনোন্মেষ কালেই আবদুল করিমের পরিবার আর্থিক প্রাচুর্যজাত সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন এবং ১২৫৯ মঘী সালের তথা ১৮৯৭ সনের প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে[৩] তাদের ঘর-বাড়ি বই-পত্রসহ প্রায় সমস্ত আসবাব তৈজস বিনষ্ট হয়, এর পরেও বহু বছর ধরে মামলা-মোকদ্দমার জের চলে ও আর্থিক সঙ্কট বাড়তে থাকে।[৪]

পারিবারিক শ্রুতি-স্মৃতি সূত্রে জানা যায়– আবদুল করিমের আদি পূর্বপুরুষ হাবিলাশ [অভিলাষ?] মল্ল। গৌড় সুলতানের [সম্ভবত ১৫৩৮-৩৯ সনে শের শাহর চট্টগ্রাম অভিযানে] সৈনিক ছিলেন, যুদ্ধে আহত হওয়ায় তাঁকে চট্টগ্রামেই থেকে যেতে হয়, তিনি যে স্থানে নিবসিত [তাঁবু (হাবিলাস) গাড়েন, স্মারকগ্রন্থ; পৃ. ৪১] হন, তা হাবিলাস দ্বীপ গ্রাম নামে আজো অভিহিত হয়। হাবিলাস তথা তাঁবুবাসী বলেই কি ইনি হাবিলাস মল্ল অথবা ইনি কি হিন্দু ছিলেন? আবদুল করিমের একক আদি পুরুষ পরম্পরা এরূপ : হাবিলাশ মল্ল–পাহাড় খাঁ মল্ল–দরিয়া খাঁ মল্ল–সিফৎমল্ল–দোস্ত মুহম্মদ আবদুল কাদির ওরফে কাদির রাজা [আনুঃ ১৭২০-৯০]– মুহম্মদ লোদী–মুহম্মদ নবী [১৭০০-১৮৯৮]– নুর উদ্দীন [১৮৩৮-৭১]– আবদুল করিম [১৮৭১ ১৯৫৩]। ষষ্ঠ প্রজন্মের কাদির রাজাই সুচক্রদণ্ডী গাঁয়ে এসে বসবাস করতে থাকেন, কাদির রাজা শিক্ষিত ছিলেন। তিনি তাঁর তৃতীয় সন্তান সামাদ আলীর পাঠের জন্যে আনুমানিক ১৭৬০-৭০ সনের দিকে কাজী দৌলতের সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী, কাব্যের প্রতিলিপি তৈরী করেছিলেন ['পুথি পরিচিতি'র পুথি সং ৫৭৭ ঢা. বি.] এর পর থেকে এ বংশে বা এ পরিবারে কেউ কখনো নিরক্ষর ছিলেন না। আবদুল করিমের পিতৃব্য কায়েমউদ্দিনের পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে এন্ট্রান্স শ্রেণির ছাত্র অবস্থায় মৃত্যু হয় ১৮৬৭ সনে। অতএব সরকারি ভাষা হিসেব ইংরেজি চালু হবার সময় থেকেই এ পরিবার প্রতীচ্য শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হয়। লেখাপড়ার চর্চা ছিল বলে বাড়িতে অমুদ্রিত আরবী ফারসী বাঙলা পুথি ও বইপত্রের সংগ্রহ ছিল।

আবদুল করিমের পিতার নাম মুন্‌শী নুরউদ্দীন [১৮৩৮-৭১] এবং তার মাতা মিসরীজান ছিলেন হুলাইনের প্রাচীন প্রখ্যাত পাঠান তরফদার দৌলত হামজা বংশের মেয়ে। অপুত্রক মাতামহের নাম ছিল মুশাররফ আলি। পিতৃবিয়োগের তিন মাস পরে আবদুল করিমের জন্ম এবং ১৮৮৮ সনে সতেরো বছর বয়সে আবদুল করিম হারালেন মাকেও। করিম যাতে মৌরসী সম্পত্তি থেকে একেবারেই বঞ্চিত না হন, সে-ব্যবস্থা করলেন পিতামহ মুহম্মদ নবী [১৭০০-৯৮] ও পিতামহী জোলেখা খাতুন। তাদের মেজো ছেলে আইনউদ্দীনের [১৮৪০-১৯৩৭] ও আফাজুন নিসার [মৃত্যু ১৯৩৩] জ্যেষ্ঠা কন্যা নয় বছরের বদিউননিসার সঙ্গে এগারো বছরের করিমের বিয়ে দিলেন ১৮৮২ সনে। ১৯২১ সন অবধি আবদুল করিম চাচার সঙ্গে বৃহৎ যৌথ পরিবারেই ছিলেন।

বাড়ির দহলিজেই [দেউরী নামে আখ্যাত] হয় আবদুল করিমের আরবী-বাঙলা ফারসীতে হাতেখড়ি। তারপর তিনি ভর্তি হন সুচক্রদণ্ডী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে। সেখানে একবছর পড়ে ভর্তি হন বাড়ির অদূরে অবস্থিত পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে। সেখানে থেকেই ১৮৯৩ সনে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জেলার অর্ধাংশে প্রথম মুসলিম ইংরেজি শিক্ষিতের অসামান্য গৌরব অর্জন করেন। সম্ভবত স্কুলে মৌলবী শিক্ষকের অভাবেই আবদুল করিমকে সংস্কৃত পড়তে হয়। চট্টগ্রাম

কলেজে দু'বছর এফ-এ পড়ার পর পরীক্ষার পূর্বে সন্নিপাত (টাইফয়েড) রোগাক্রান্ত হন, ফলে পরীক্ষা দেওয়া হল না, উচ্চশিক্ষারও ইতি ঘটে এখানেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পিতৃব্য আইনউদ্দীনেরও ইংরেজি অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় ছিল এবং তাঁর সব সন্তানই ইংরেজি শিক্ষিত শিক্ষক ও কেরানী ছিলেন বিভিন্ন অফিসে।

কলেজজীবনে আলতাফ আলি চৌধুরী [১৮৯৩ সনে] নামে এক সহপাঠীকে আবদুল করিম অভিন্নহৃদয় বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। তাঁর কোষ্ঠীপত্রের পিঠে লেখা থেকে তারই প্রমাণ মেলে।[৫] তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন আবদুল করিম। এ বন্ধুকে তিনি সারাজীবন স্মরণ করেছেন। একমাত্র সন্তান কন্যার নামও রেখেছিলেন তাই আলতাফুন নিসা [১৯০১-৭৭ সন]।

আবদুল করিম শৈশবে-বাল্যে দেখা বাড়ির পুথি-কেতাব ও মুদ্রিত বইপত্র প্রভৃতির প্রতি স্কুলজীবনেই আকৃষ্ট হন। ফলে স্কুলজীবনেই তিনি হাতে লেখা জটিল কলমী পুথি পড়তে শেখেন। বাড়ির পুথি-কেতাব-বইপত্রের মূল্যবান সংগ্রহটি ১৮৯৭ সনের ঝড়ে ঘর ভাঙার ও উড়িয়ে নেয়ার ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আবদুল করিম গৈরলাবাসী দুই সহপাঠীকে সাপ্তাহিক 'অনুসন্ধান'-এর গ্রাহক হতে দেখে নিজেও নবম [সেকালের দ্বিতীয়] শ্রেণির ছাত্র থাকাকাল থেকেই নানা পত্রিকার গ্রাহক হতে থাকেন। স্কুল ছাত্র হিসেবেই তিনি উইকলি 'হোপ সাপ্তাহিক প্রকৃতি এবং আটখানা মাসিক পত্রের গ্রাহক হন। [স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৪২]। ক্রমে তিনি বিভিন্ন ধরনের চল্লিশখানি পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক হয়েছিলেন। দৈনিক-সাপ্তাহিক পাক্ষিক-মাসিক পত্রিকা পড়ার আগ্রহ বা নেশা তার সারা জীবন অব্যাহত ছিল।

কলেজ ছাড়ার পর তিনি চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল স্কুলে শিক্ষক হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের অস্থায়ী পদ গ্রহণ করেন। সেখানে কার্যকাল শেষ হলে আবদুল করিম চট্টগ্রাম প্রথম সাবজজ আদালতে 'এপ্রেন্টিস' বা শিক্ষানবীশ পদে যোগ দেন এবং ১৮৯৭ সনে বদলী হয়ে আসেন পটিয়া মুন্সেফ আদালতে।

কবি নবীনচন্দ্র সেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত সেকালের প্রথম শ্রেণির মাসিকপত্র 'পূর্ণিমা'য় আবদুল করিমের প্রবন্ধ দেখেই তাঁর সঙ্গে পত্রালাপে পরিচয় করেন। কবি নবীন সেন চট্টগ্রামে কমিশনারের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে এসেই ১৮৯৮ সনে আবদুল করিমকেও কমিশনার অফিসের কেরানী করিয়ে শহরে নিয়ে আসেন।[৬]

এ সময়ে সুচক্রদণ্ডী গাঁয়ের কালীশঙ্কর চক্রবর্তী সাপ্তাহিক 'জ্যোতিঃ' পত্রিকার মালিক, সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল করিমের পিতামহ

মুহম্মদ নবীর অনুরাগী ও অনুগত। পুথি-পাগল আবদুল করিম পুথি যোগাড় মানসে 'জ্যোতিঃ' পত্রিকায় এক আবেদনে জানান, যাঁরা তাঁকে পুথি সংগ্রহ করে দেবেন বা পুথির সন্ধান দেবেন, তাঁদেরকে একবছর বিনামূল্যে 'জ্যোতিঃ' পত্রিকার গ্রাহক করে নেয়া হবে। কমিশনার অফিসে 'জ্যোতি' পত্রিকার ও এ বিজ্ঞাপনের সঙ্গে নবীন সেনেরও সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। ফলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নবীন সেন হলেন কুমিল্লায় বদলী আর কেরানী করিম হারালেন চাকরি। কেবল তা নয়, সরকারি চাকরি প্রাপ্তির অধিকারও হারালেন। পরে অবশ্য আপিলে তা রহিত বা বাতিল হয়। রেঙ্গুনযাত্রার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন আবদুল করিম চাকরির সন্ধানে। কিন্তু পরিবারের সম্মতি না থাকায় বার্মা যাওয়া হয় নি। কিছুদিন বেকার থাকার পর তিনি আনোয়ারা মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আনোয়ারাবাসী রাজচন্দ্র সেন ছিলেন আবদুল করিমের গুণমুগ্ধ। তিনিই স্কুলে মুসলিম প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করে কালিক-প্রথা ভঙ্গ করেন। এখানে তিনি সুযোগ্য শিক্ষক, প্রশাসক ও লেখক হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেন। আবদুল করিম তার আনোয়ারা স্কুলে শিক্ষকতার কালকে পুথি সংগ্রহের এবং লেখক হিসেবে পরিচিত হওয়ার স্বর্ণযুগ বলেই পরবর্তী জীবনে সানন্দে স্মরণ করতেন। তারপর ১৯০৬ সনে চট্টগ্রাম বিভাগের ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' (১৮৯৮ সন) প্রণেতা আবদুল করিমের আগ্রহে তাঁর অফিসে দ্বিতীয় কেরানীর পদে যোগ দেন। এখান থেকেই তিনি ১৯৩৪ সনের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে অবসর গ্রহণ করেন।

অতএব, তাঁর কর্মজীবনের ফিরিস্তি এরূপ : ১. চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে শিক্ষক–কয়েক মাস ১৮৯৫ সন। ২. সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজি স্কুলে প্রধান শিক্ষক। এক বছর–১৮৯৫-৯৬ সন। ৩. জজ আদালতে এ্যাপ্রেন্টিস [শহরে ও পটিয়ায়]–১৮৯৬-৯৭ সন। ৪. কমিশনার অফিসে ক্লার্ক–১৮৯৮ [জানুয়ারি থেকে] সন। ৫. আনোয়ারা মধ্য ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক–১৮৯৯-১৯০৫ সন। ৬. বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর অফিসে ক্লার্ক–১৯০৬-৩৪ সন। সার্টিফিকেট অনুসারে ৫৬ বছর বয়সে (অতিরিক্ত এক বছর চাকরি করেন] এবং বাস্তবে ৬৫ বছর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তখন তিনি মাসিক বেতন পেতেন ১২০ টাকা, অবসর ভাতা পেতেন ৬০ টাকা এবং ১৯৩৯ সন থেকে সরকার থেকে সাহিত্যিক বৃত্তি পেতেন ৬০ টাকা। আমৃত্যু মাসিক আয় ছিল ১২০ টাকা।

এ সূত্রে বিশেষ উল্লেখ্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পর্বে ১৯২০ সনে স্পেসিয়াল অফিসার ছিলেন পূর্ববাঙলার শিক্ষাবিদ অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টর খানবাহাদুর আবদুল আজিজ বি-এ। তিনি তাঁর পূর্বতন কেরানী আবদুল করিমের গুণগ্রাহী ছিলেন। এই মুসলিম লেখক-সাহিত্যগবেষকের সুবিধে হবে মনে করে

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ Stapleton-কে সুপারিশ করে আবদুল করিমকে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বুদ্ধিপরামর্শ দেয়ার লোকের অভাবে আবদুল করিম সরকারি চাকরির পেনশনের লোভে বিশ্ববিদ্যালয়ের পেনশনহীন চাকরি নিতে রাজি হন নি[৭]।

কাদির রাজা পরিবারের আঞ্চলিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল চিরকাল। কাদির রাজা, লোদী, নবী, আইনউদ্দীন ছিলেন প্রজন্মক্রমে স্থানীয়ভাবে ধনবান, প্রভাবশালী, দর্প-দাপটের লোক। আর পারিবারিক শ্রুতিস্মৃতি এই যে ১১৭৬ সালের [১৭৬৯-৭০] মন্বন্তর ছিল স্থানীয় ভাষায় 'সাত পইস্যার রাট' অর্থাৎ প্রতি সের চাউলের দাম হয়েছিল সাতপয়সা–সেকালের কড়ির যুগে এ ছিল অগ্নিমূল্য। চারদিককার গাঁয়ের অনাহারক্লিষ্টদের নঙ্গরখানা খুলে ও ধান-চাউল খয়রাত করে বাঁচিয়ে ছিলেন বলে তাঁকে লোকে [আবদুল] 'কাদির রাজা' নামে অভিহিত করে। এ সূত্রেই তিনি কর্ণফুলী ও শঙ্খনদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। 'দুর্ভিক্ষের সময় অন্নদান করে তাঁর এক পূর্বপুরুষের জন-সমাজে রাজাখ্যাতি লাভ হয়েছিল।'

আর আবদুল করিম বঙ্গবিখ্যাত হন তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্যেই। অবসরজীবনে তিনি বাস করতেন গাঁয়ের বাড়িতে। এ সময়ে তিনি ইউনিয়নবাসী অনেকের আগ্রহে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য হয়ে বোর্ডের ও বেঞ্চের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দশ বছর [১৯৩৫-৪৫] ধরে জনগণের সেবা, সালিশ ও বিচারকার্য চালিয়েছেন। তিনি পটিয়া আঞ্চলিক ঋণ সালিশী বোর্ডেরও ছিলেন চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট।

তার এক ঈর্ষ্যভক্ত অন্য এক প্রার্থীকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ বা ১৯৩৯ সনে তাঁকে চট্টগ্রাম জিলাবোর্ডের সদস্য-পদপ্রার্থীরূপে দাঁড় করিয়েছিলেন এবং তিনি ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। তবে পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ও দক্ষিণ ভূর্ষি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পর্ষদের তিনি ছিলেন দীর্ঘকাল ধরে মৃত্যুপূর্বাবধি সভাপতি। ১৯৪৭ সন অবধি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর ও তাঁর গবেষণাকর্মের বিশেষ আদর-কদর ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও তিনি কয়েকবছর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। সহসভাপতি পদে বৃত করেও বিদ্বৎসমাজ তাকে সম্মানিত করেছেন একবার [১৩২৬ সালে, সভাপতি ছিলেন সে বছরের জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী] ইতঃপূর্বে ১৯০৩ সনেই তাঁকে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য (Fellow)[৮] করে সম্মানিত করা হয়। চট্টল ধর্মমণ্ডলী তাঁর সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'সাহিত্যবিশারদ' [১৯০৯ সনে] উপাধি দান করেন। এবং নদীয়ার সাহিত্যসভাও তাঁকে 'সাহিত্যসাগর' [১৯২০ সনে] উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন, তবে তিনি কেবল প্রথমটাই নামের সঙ্গে যোগ করতেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কবি নবীনচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী, রাজদূত-গবেষক শরচ্চন্দ্র দাশ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দীনেশচন্দ্র সেন, সৈয়দ এমদাদ আলী, কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শশাঙ্কমোহন সেন, এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ অনেকেই তাঁর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন এবং সম্পর্কানুযায়ী করিম ছিলেন এঁদের স্নেহ প্রীতি-শ্রদ্ধা ভাজন। গুণগ্রাহী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেরানী আবদুল করিমকে প্রথমে প্রবেশিকার ও পরে বিএ-র বাঙলার পরীক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৪৭ সন অবধি তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পরীক্ষার বাঙলা ভাষা-সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও ১৯৫১ সনে বাঙলা অনার্সের একটি পত্রের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিয়োগ করেছিল। তিনি যেসব সম্মান পেয়েছিলেন, সেগুলো :

১৯১৮ সনে চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ১৯২৯ [৩০?] সনে রাউজানে কেন্দ্রিয় মুসলিম তরুণ সঙ্ঘ আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি। ১৯৩৩ সনে চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদের সম্মেলনে সংবর্ধনা লাভ। ১৯৩৬ সনে 'পূরবী' সাহিত্য সমিতির সংবর্ধনা প্রাপ্তি। ১৯৩৭ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তৃতদান। ১৯৩৯ সনে কলিকাতা মুসলিম সমিতির সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। ১৯৪৫ সনে প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে সম্মানিত অতিথি। ১৯৫০ সনে চট্টগ্রামে নিয়াজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর সাহিত্য সম্মেলনে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ। ১৯৫১ সনে চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সম্মেলনে মূল সভাপতি। ১৯৫২ সনে কুমিল্লা সংস্কৃতি সম্মেলনে মূল সভাপতি।

এছাড়া কোলকাতায় ও নাটোরে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে বিশেষ আমন্ত্রণে যোগ দিয়ে ছিলেন।

সাহিত্যজগতে তাঁর খ্যাতির কারণেই পত্রিকার মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্যেই চার চারটি সাময়িক সাহিত্য পত্রেরও আত্মপ্রকাশকালে তাঁকে অবৈতনিক সম্পাদক করা হয়েছিল। সৈয়দ এমদাদ আলি প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'নবনূর' [১৯০৩ সনে প্রকাশিত], এয়াকুব আলি চৌধুরী প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'কোহিনূর' [১৩০৯ সাল], মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'সওগাত' [১৯১৮], আবদুর রশিদ সিদ্দিকী প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'সাধনা' [১৩২৭) এবং 'পূজারী' নামের একটি পত্রিকাও প্রধান সম্পাদক হিসেবে তাঁর নামাঙ্কিত হয়েই গোড়ার দিকে প্রকাশিত ও সমাজে পরিচিত হয়। এতেই বোঝা যায় এ শতকের গোড়ার দিকে মুসলিম সমাজে তিনি ছিলেন গবেষক-প্রাবন্ধিক হিসেবে প্রায় মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড। বস্তুত আবদুল করিমই কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব পূর্বকালে ছিলেন একমাত্র মুসলিম লেখক, যিনি হিন্দু-মুসলিম সমাজে সমভাবে ছিলেন পরিচিত, স্বীকৃত, খ্যাত এবং সমাদৃত।

৩. আবদুল করিমের স্বভাব ও জীবনাচার

এবার আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের স্বভাব-চরিত্রের, মন-মননের, ভাব-চিন্তাকর্ম আচরণের কিছু পরিচয় দিচ্ছি :

আবদুল করিম সারা জীবন সৎ, সরল, নির্বিরোধ, পরউপকারী, অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, ভৃত্যবৎসল ও পাঠনিষ্ঠ লোক ছিলেন।

ক. তাঁর সততা, ঘৃণা-হিংসা-অসূয়ামুক্ত সহৃদয়তা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তেমন স্বল্পসংখ্যক মানুষ যাঁরা আজো জীবিত রয়েছেন বাঙলাদেশে তাঁরাই এর সাক্ষ্য। পরিবারের সামান্য জমিদারী ঋণজালে বিজড়িত হয়ে পড়েছিল, যমের দোসর মহাজনদের উৎপাতরূপ ঝড়েও তাঁদের শান্তিময় জীবন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, মামলা-মোকদ্দমা ও ঋণের দায়ে ক্ষুদ্র সম্পত্তি একরূপ ছারখার হয়ে যায়, তখনো আবদুল করিম নিজেকে এসবের সঙ্গে জড়িত রাখেননি। [জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, পৃ. ২৭, স্মারকগ্রন্থ, বা. এ.] তিনি সংসারে থেকেও বিষয়কর্মের ঝামেলা এড়িয়ে চলেছিলেন সারা জীবন। গাঁয়ের নিরক্ষর সচ্ছল গৃহস্থ মকবুল আলির সঙ্গে ছিল তাঁর আবাল্য সখ্য। এ মকবুল আলির সঙ্গে তাঁর পরিবারের চলছিল দীর্ঘকাল ধরে বহু ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা, দাঙ্গা বা মারামারি হয়েছিল কয়েকটা, তবু মকবুলের সঙ্গে তাঁর সখ্যে ও আড্ডায় ছেদ পড়ে নি কখনো, ছেদ পড়ল ১৯৪৪ সনে মকবুলের মৃত্যুতে। আগে আড্ডা বসত ছুটিছাটায়, অবসর গ্রহণের পরে ঘণ্টা দুয়েক আলাপচারিতা চলত রাত্রে আহারের পরে। মাহবুব-উল আলম লিখেছেন যৌবনে প্রতিবেশী মকবুল তাঁর সান্নিধ্য সুখের দোসর হয়ে পড়ে। মকবুল ছিল চাষী মানুষ, কিন্তু মামলাবাজ। তাঁদের সঙ্গেও মামলা লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু, তা সত্ত্বেও আবদুল করিম ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে সামনে বসিয়ে হুঁকা টানতেন, তাঁর অপূর্ব ভঙ্গিতে আলাপ করতেন।' (স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৩৩)।

খ. আবদুল করিম ছিলেন শিশুগত প্রাণ। বাড়ির কারো না কারো একটা শিশুকে কোলে নিয়ে আদর না করলে যেন তার দিন কাটত না। চার-পাঁচ বছর বয়স হয়ে গেলেই কেবল আর কোলে নিতেন না, নতুন শিশুর জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। বাড়িতে শিশু না থাকলে প্রতিবেশীর শিশুকে আদর করে সাধ মেটাতেন। প্রত্যক্ষদর্শী মাহবুব-উল আলমের ভাষায় সারাজীবন একটা না একটা শিশুর স্নেহ-ডোরে বাঁধা ছিলেন তিনি। [স্মারকগ্রন্থ পৃ. ৩৪] শৈশব-বাল্য অতিক্রান্ত হলেও বিশেষ স্নেহবশে তিনি ভ্রাতৃ কন্যাকে বিবাহকাল অবধি এবং আহমদ শরীফকে ও এক দৌহিত্র সৈয়দ উদ্দীনকে [২৩ বছর বয়সে তার যক্ষ্মা রোগে ১৯৪৬ সনে মৃত্যু ঘটে] তিনি লালন করেছেন।

গ. তাঁর চাকুরে জীবনে বাসার এবং বাড়ির ব্যক্তিগত ভৃত্যকে তিনি চিরকাল সন্তানের মতো ভালো বেসেছেন, এবং তাঁর জীবনে যে-কয়জন ভৃত্য বা গৃহ কর্মের লোক ছিল, প্রত্যেককেই তিনি সাধ্যমতো অর্থ সাহায্য করে চাষী হিসেবে কিংবা অফিসে-কারখানায়-দোকানে কাজ যোগাড় করে দিয়েছেন, সব ভৃত্যকেই তিনি স্বয়ং সাক্ষর করেছিলেন। এক বালক ভৃত্যের আকস্মিক মৃত্যু হলে তিনি তার মা-বাবাকে সামান্য অর্থ সাহায্য করতেন। পরে তার বিধবা মাকে তিনি তার মৃত্যুকাল অবধি ভাত-কাপড় যুগিয়েছেন। আনসার, মুসা খাঁ, আমজু, গনি, সালামত খাঁ, গফুর, আবুলের মা প্রভৃতির নাম গাঁয়ের বৃদ্ধ লোকের এখনো স্মরণে রয়েছে।

ঘ. গাঁয়ের এক পুকুর ছিল করিম পরিবারের অধিকারে, যদিও সে-পুকুর গাঁয়ের আরো দুটো পরিবারের পরোক্ষ স্বত্ব ছিল, কিন্তু তাদের দখলে ছিল না। ওরা দখল পাবার জন্যে আদালতে মামলা করে। প্রমূর্ত সততা আবদুল করিম স্বস্বার্থেও মিথ্যে বলবেন না–এ দৃঢ় বিশ্বাস বশে জেনে-বুঝেই তারা সাক্ষী মানে আবদুল করিমকেই। বলাবাহুল্য তাঁর সাক্ষ্যতেই ওরা মামলায় জয়ী হয়।

ঙ. আবদুল করিম আবাল্য তামাক খেতেন। বিধবা মায়ের কোলে বসেই নাকি তামাক খাওয়া শুরু করেছিলেন বাল্যে, বাড়িতে সর্বক্ষণই হুঁকা টানতেন, তবে বাইরে খেতেন চুরুট। বিড়ির প্রতি ছিল অবজ্ঞা আর সিগারেটের প্রতি ছিল বিদ্বেষ। বিদ্বেষ ছিল চা-এর প্রতিও, জীবনে কখনো সর্দি-কাশিতেও তিনি চা পান করেন নি, যদিও তাঁর পত্নী সকালে বিকেলে চা খেতেন, আর শারীরিক কারণে আফিমও সেবন করতেন। সে-আফিম একসঙ্গে বেশি মাত্রায় ক্রয় করতে হলে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হত। সে-অনুমতি নিতে একবার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছেও গিয়েছিলেন, তাতে রায়ের ধারণা হয়েছিল বুঝি সাহিত্যবিশারদ আফিমখোর [১৯৮৪ সনের ২১ ডিসেম্বর 'দৈনিক বাংলা'-য় অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন বর্ণিত]।

চ. আবদুল করিম সাধারণভাবে শান্ত প্রকৃতির ছিলেন বটে, কিন্তু 'জেদ' ছিল অসামান্য। ক্বচিৎ কখনো ক্রোধে-অভিমানেও দু-চারবার সবাইকে চমকে দিয়েছেন। শুধু তা নয় সঙ্কটও সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বাল্যের-যৌবনের বিষয় জানাবার লোক নেই এখন। কিন্তু চারটে ঘটনা আমাদের জানা আছে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় ইন্সপেক্টর অব স্কুলস ছিলেন তখন প্রখ্যাত লেখক শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ [মখদুমী আহসানউল্লাহ লাইব্রেরীর মালিক] দ্বিতীয় কেরানী আবদুল করিমকে কোন ফাইলের বিষয় নিয়ে তিনি বকাবকি করলে ক্রুদ্ধ আবদুল করিম তার গায়ের উপর ফাইল ছুঁড়ে ফেলে অফিস ছেড়ে চলে আসেন। চাকরি যায় আর কি! তখন সহকারী ইন্সপেক্টর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর আবদুল আজিজ বিএ-র অনুরোধে এ প্রখ্যাত লেখককে আহসানউল্লাহ নিজগুণে ক্ষমা করে দেন বটে, কিন্তু আবদুল করিম বেঁকে বসেন, তিনি

চাকরি আর করবেনই না। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুর সাধাসাধিতে এবং আবদুল আজিজের উপদেশে অবশেষে তিনি চাকরিতে যোগ দেন এবং আহসানউল্লাহ সাহেবও পরম উদারতায় তাঁর সঙ্গে মালিন্যমুক্ত সৎ ও সদয় ব্যবহার করতে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাঁর পিতৃব্য মুনশী আইনউদ্দিনও সেরেস্তাদারের সঙ্গে উদ্ধত আচরণের জন্যে ১৮৮০-৮২ সনের দিকে চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন। আর একবার পত্নীর সঙ্গে কথা কাটাকাটির ফলে প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা অন্নজল গ্রহণে বিরত থাকেন। বাড়ির লোকের সাহস হয়নি সাধাসাধি করবার, বাইরের শ্রদ্ধেয় আত্মীয়-বন্ধুর বহু অনুরোধে উপরোধে অবশেষে অন্নগ্রহণে সম্মত হন। তাঁর একমাত্র মেয়েও অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ভালো-লাগা একটি ছেলের সঙ্গে পিতৃব্যসহ পরিবারের সদস্যদের অমতে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে [১৯৩৬ সনে] সার্কল অফিসারের সঙ্গে পটিয়া রেলস্টেশনেই তাঁর কোন বিষয়ে বচসা শুরু হয়, তিনি ছাতা দিয়ে অফিসারকে মারতে উদ্যত হন। ট্রেনের দর্শকদের কেউ কেউ দৈনিক 'পাঞ্চজন্যে' এবং সাপ্তাহিক 'সত্যবার্তায়' অফিসারকে ঐ ঘটনার জন্যে দায়ী ও নিন্দা করে চিঠি প্রকাশিত করেন। সেরেস্তাদার আবদুল ওদুদের মধ্যস্থতায় এ বিবাদ মেটে।

আর একবার ক্রুদ্ধ আবদুল করিমকে মূর্চ্ছিত হতে দেখা গেছে। ১৯৫৩ সনের মার্চ মাসে পত্নীবিয়োগের মাসতিনেক পরে এবং তাঁর নিজের মৃত্যুর মাসতিনেক আগে কি কারণে বাড়ির কারো উপর অভিমান করে শহরে ভ্রাতুষ্পুত্রদের কারো বাসায় কিংবা কন্যার বাড়ি না গিয়ে সাহিত্যিক আবুল ফজলের বাড়িতে ওঠেন। ভ্রাতুষ্পুত্রদের সাধাসাধিতেও তিনি টলেন নি। অবশ্য দুদিন পরে নিজেই গাঁয়ের বাড়ি ফিরে যান।

ছ. কেবল ভৃত্যদের নয়, গাঁয়ের কিছু দরিদ্র পরিবারকেও তিনি মাঝে মধ্যে গোপনে (তাঁর পত্নী সমর্থন করতেন না বলে) অর্থ সাহায্য করতেন। তাঁর অবসর ভাতা ষাট টাকা ও সাহিত্যবৃত্তি ষাট টাকা স্ত্রীর হাতেই তুলে দিতে হত এবং ১৯৪৫ সন থেকে আহমদ শরীফ প্রেরিত টাকাও। কাজেই নানা অজুহাতে কিছু টাকা তাঁর থেকে পাওয়া গেলেও তা দিয়ে তাঁর দানপাত্রদের প্রয়োজন মিটত না। ফলে তিনি সময়ে সময়ে এক সওদাগর ও পটিয়া স্কুলের দুজন শিক্ষক থেকে ধার করতেন [সম্ভবত দু একবার ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক থেকেও, যা শোধ করতে হয়নি]। আহমদ শরীফও তাঁর ওই সব গোপন খরচের জন্যে তাঁর নির্দেশে মনিঅর্ডার পাঠাতেন উক্ত সওদাগর ও শিক্ষকদের নামে। তবু এভাবে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর লেখা ঋণের হিসাব-খাতায় প্রায় দেড় হাজার টাকা অপরিশোধিত দেখা গেল। সে ঋণ অবশ্য কড়ায়গণ্ডায় তাঁর উত্তরাধিকারী পরিশোধ করেছে।

জ. চাকরিজীবনে দশটা থেকে পাঁচটা অবধি ফাইল পড়ে-লিখে শ্রান্ত হলেও সকালে ও রাত্রে তিনি সোৎসাহে পুথিপত্র বই পড়ে ও লিখে অবসরমুহূর্তগুলো কাজে লাগিয়েছেন। এভাবে সময় সাপেক্ষ কষ্টসাধ্য পুথি পাঠ করে পাঁচ-ছয় শতাধিক পুথি

পরিচায়ক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও ভূমিকা লিখেছেন, লিখেছেন ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ, গ্রন্থসমালোচনা কিংবা পুস্তকপরিচিতি। সর্বোপরি অনেকগুলো পুথির স্বহস্তে পাণ্ডুলিপি তৈরী ও অনেক প্রতিলিপি দেখে এক একটা পুথির পাঠ সংশোধন করে সম্পাদনা করেছেন। এ কাজে ধৈর্য শ্রম ও সময় লেগেছে অপরিমেয়। সাহিত্য সেবাই ছিল তাঁর সাধনা ও এবাদত।

ঝ. আচারিক ধর্মে আবদুল করিম বিশেষ নিষ্ঠা ছিলেন না, কখনো রোজা রাখতেন তবে নামাজ সব সময়ে পড়তেন না। এমন কি বার্ধক্যেও অবিচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত নামাজ পড়েন নি। অবশ্য জুম্মার নামাজে হাজির থাকতেন। উল্লেখ্য যে, এ পরিবার ছেলেমেয়েদের নামাজ পড়বার বা রোজা রাখবার তাগিদও দিত না। ধর্মশিক্ষা দানেও তেমন গুরুত্ব দেয় নি। ছেলেরা সংস্কৃত, পালি, ফারসী ও আরবী পড়েছে ইচ্ছে মতো ৭ম শ্রেণি থেকে। হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শেও তিনি হজ করতে রাজি হননি আর স্নেহের পাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ শরীফকে বঞ্চিত করে আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ সত্ত্বেও পিতৃপুরুষের মসজিদে কয়েক কানি সম্পত্তির সামান্য অংশ দিতেও রাজি হননি। লোভ করেন নি সওয়াবের! স্নেহের দায়িত্বের কাছে হার মানল সওয়াবের লোভ। অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কাদির রাজা থেকে এ বংশের কেউ ১৯৫৪ সনের আগে হজব্রতও পালন করেন নি।

ঞ. আবদুল করিম ছিলেন স্নেহান্ধ ব্যক্তি। স্নেহভাজনের জন্যে তিনি হৃদয়-মন অর্থ ঢেলে দিতেন। আনোয়ারা মধ্য ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকাকালে দুইজন স্থানীয় দরিদ্র সন্তান আজিজুর রহমান [আনোয়ারার সোলকাটা গ্রামবাসী] ও নিশি চন্দ্র ঘোষ [কবি জীবেন্দ্র কুমার দত্তের প্রতিবেশী আনোয়ারা গ্রাম] তাঁর এতই প্রিয় ছিলেন যে তিনি চট্টগ্রাম শহরে ইন্সপেক্টর অফিসে কেরানী হয়ে আসার পরেও তাঁদের বিদ্যালয়ের ব্যয় স্বেচ্ছায় বহন করে প্রথম জনকে এন্ট্রাস পাশ করিয়ে তাঁর নিজের অফিসে কেরানী পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন এবং নিশি ঘোষও তাঁর অর্থেই বিএ পাশ করে সীতাকুণ্ড উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে সুদীর্ঘকাল প্রধান শিক্ষক থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এঁরা দুজনেই দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং সত্তরের দশকের শুরুতে তাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁর জামাতা আবদুল মোনায়েমও তাঁর তেমন একজন স্নেহভাজন তরুণ ছিলেন। স্নেহবশেই তাঁকে পরিবারের সবার অমতেই জামাতা করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও গাঁয়ের দু'একজন গরীব ছাত্রকে অর্থসাহায্য করেছেন।

ট. নির্বিশেষ মানুষের প্রতি আবদুল করিমের একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ছিল। এ জন্যেই সারাজীবনে তাঁর চিন্তায় চেতনায় কর্মে আচরণে জাত-বর্ণ-ধর্ম বা আর্থিক অবস্থানভেদের জন্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরুও হিন্দু রচিত পদাবলীর পরিচিতি দানের মাধ্যম। বিদ্যালয়েও প্রধান শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন মুখ্যত হিন্দু সন্তানদেরই। মুসলিম ছাত্র ছিল নগণ্য। হিন্দু ছাত্রদের অনেকেই ছিলেন

তাঁর স্নেহধন্য, বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়েও তাঁরা মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের এ শিক্ষককে পরবর্তী জীবনেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন।

ঠ. পুথিও সংগ্রহ করেছেন হিন্দু-মুসলিম অভেদে, তাঁর আগে এমন অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে কেউ পুথি সংগ্রহ করেন নি, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কিংবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন শাখা, আর কারো কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাই তার প্রমাণ।

আবদুল করিমের পুথি সংগ্রহপদ্ধতি সম্বন্ধে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ব্যজস্তুতি অলঙ্কার প্রয়োগে এক রসাল 'ঘুষতত্ত্ব' প্রচার করেন, তা আজকাল অধ্যাপক আহসাব উদ্দিন আহমদ, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী প্রমুখ সবাই তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রচারিত রেডিয়ো ভাষণে কিংবা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ও স্মৃতিসভায় ইচ্ছে মতো পল্লবিত করে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন স্কুলের শিক্ষক-সেক্রেটারীরা তাঁর কাছে স্কুলের সরকারি মঞ্জুরী প্রভৃতির তদবিরে গেলে তিনি পুথি যোগাড় করে দেয়ার শর্তসাপেক্ষে তাঁদের কাজ আটকাতেন কিংবা পুথি পেলেই কাজ করে দিতেন। এ কথার মধ্যে স্থূল রস-রসিকতা থাকলেও এতটুকু সত্য বা তথ্য নিহিত নেই, তা প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এ লেখক দৃঢ়তার সঙ্গে বলছে। তাছাড়া গোটা চট্টগ্রাম বিভাগে হাইস্কুল কয়টিই বা ছিল। শিক্ষকরাও ছিলেন সাধারণভাবে হিন্দুই, মুসলিম ঘরে পুথি থাকার সম্ভাবনা হিন্দু মনে কখনো জাগেইনি, ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ অফিসে স্কুলের বারোমাসে কাজ থাকে না। কাজেই সেভাবে কয়টা পুথিই বা সংগৃহীত হয়েছে। বরং আবদুল করিম সংকলিত পুথির বিবরণ ও পুথিপরিচিতি গ্রন্থের সাক্ষ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে যে ত্রিপুরা-নোয়াখালীর পুথি নিতান্ত স্বল্প সংখ্যক। মঘী সনের উল্লেখ ও লিপিকরের বা পুথির মালিকের নামনিবাস থেকে জানা যায় যে প্রায় সব পুথিরই সংগ্রহস্থান চট্টগ্রাম। অতএব, 'ঘুষতত্ত্ব'টি বানানো। অধ্যাপক আসহাবউদ্দীনের বর্ণিত 'পকেটমার' গল্পটিও ভিত্তিহীন। করিম-চরিত্রে মহিমাদানের জন্যেই কল্পিত। বাস্তবে আবদুল করিম আমৃত্যু আত্মীয়-বন্ধু পরিচিত-অপরিচিত যে-কোন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে যে-কোন স্থানে, সময়ে ও উপলক্ষে দেখা হলেই পুথির সন্ধান চাইতেন, পুথি যোগাড় করে দিতে বলতেন, সন্ধান দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানাতেন। কারো কাজ করে দেয়ার শর্ত হিসেবে পুথি দাবি করেননি কখনো। চাকরি জীবনে In Cash না হলেও এটাও হত ঘুষ In kind, সে-ধরনের আত্মমর্যাদারিক্ত মানুষই ছিলেন না তিনি। ইউনিয়ন বোর্ডের কাজে বিভিন্ন গাঁয়ে যখন যেতেন, তখনো তিনি পুথির খোঁজ করতেন। দৈনিক পত্রিকাই তিনি প্রতি পুথির আবরণ হিসেবে ব্যবহার করতেন, প্রতি পুথির নামের সঙ্গে কোন গ্রামের কে পুথি দিয়েছেন, তাও লেখা থাকত পুথির আবরণের উপর। তিনি বহু পুথি নগদ অর্থে ক্রয়ও করেছেন। সে অর্থের মোট অঙ্ক হয়তো তিন-চার হাজারের বেশি হবে।

ড. সূর্যসেনপন্থী সন্ত্রাসবাদী ও পটিয়ার ভাটিখাইনবাসী হরিপদ ভট্টাচার্য চট্টগ্রামের পুলিশ-সুপার খানবাহাদুর আহসানউল্লাহকে নিজাম পল্টনে ফুটবল খেলার মাঠে হত্যা করেন [১৯৩১ সনের ৩০শে আগস্টের বিকেলে) এবং পলায়নকালে মাঠেই ধৃত হন। এ মামলায় একজন জুরার ছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতাকামী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তিনি হরিপদকে নির্দোষ বলে মত দেন এবং একজন জুরারকে অনুনয় করে স্বমতে আনেন। ফলে সংখ্যাগুরুর মতে হরিপদ নির্দোষ সাব্যস্ত হন, তবু সংখ্যাগুরুর মত অগ্রাহ্য করে ষোল বছর বয়স্ক হরিপদকে ফাঁসির বদলে জেল দেয়া হল। এদিকে অন্যান্য মুসলিম জুরার এবং শহরের মুসলমানরা আবদুল করিমের প্রতি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হলেন। কয়েক মাস তাঁকে ভয়ে ভয়ে পথ চলতে হয়, উল্লেখ্য যে আহসানউল্লাহ হত্যার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের তথা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনারের গোপন প্ররোচনায় ও নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে মুসলিম গুণ্ডারা হিন্দুর দোকান-পাট লুট করে। কিন্তু প্ররোচনা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধেনি।[৯]

ঢ. আবদুল করিমের কিছু সাহিত্যকর্ম অন্যরা আত্মসাৎ করলেও, আবদুল করিম ক্ষুব্ধ হলেও মামলায় কিংবা বাদ-প্রতিবাদে উৎসাহ বোধ করেন নি। তবু এ অপকর্মের কথা সারা দেশে যথাসময়ে জানাজানি হয়ে গেল। নিন্দিত হয়েছিলেন দায়ী ব্যক্তিরা।[১০]

ণ. আবদুল করিমই প্রথম বাঙলা ভাষাকে নির্ভীক চিত্তে উচ্চকণ্ঠে কেবল মাতৃভাষা বা স্বদেশী ভাষা নয় মুসলিমদের জাতীয়ভাষা বলে ঘোষণা করেন, যখন অনেক মুসলমানই বাঙলাভাষা বর্জনের জন্যে প্রচার চালাচ্ছিল।[১১] পরে পাকিস্তানে ভাষা-বির্তকে বাঙলাভাষার পক্ষে অন্যদের সঙ্গে বিবৃতিতে ও স্মারকলিপিতে সই দিয়েছিলেন।[১২] বাঙলাভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার কথাও বলেছেন, উচ্চশিক্ষার মাধ্যমও বাঙলা করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।[১৩] পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলার দাবি জানিয়ে তিনি প্রবন্ধও লিখেছেন।[১৪] তাঁর মনের দর্পণে ছিল বাঙলার ও বাঙালির মধ্যযুগের জীবনচিত্র, চোখের সামনে ছিল বাস্তব বর্তমান আর কল্পনায় ছিল ভবিষ্যৎ। বাঙলাদেশ, বাঙলাভাষা ও বাঙালি জাতি ছিল সারা জীবন ধরে তাঁর অনুধ্যানের বিষয়।

ত. সাহিত্য সম্মেলনাদিতে আসকান-পাজামা পরলেও আবদুল করিম অফিসে ও সভায় যেতেন ধুতি-পাঞ্জাবি ও চাদর পরে। মাথায় থাকত অবশ্য ফেজটুপির আকারের মাড় দেয়া ফুলেল সাদা টুপি। শীতকালে পরতেন ধুতি, ফ্লানেলের শার্ট, গলাবন্দ বা বুকখোলা কোট। জব্বা অবধি ঝুললে আসকান, হাঁটুর উপরে সীমিত থাকলে হয় শেরওয়ানী, নিতম্বে নিবদ্ধ থাকলে হয় গলাবন্ধ কোট, বোতামবিহীন হলে হয় গাউন বা চৌকা আর বুকের উপর দুই অংশ গোলচক্র বিশিষ্ট হলে হয় চাপকান। আবদুল করিম প্রথম তিনটেই পরেছেন, প্যান্ট চাপকান পরেননি কখনো। পাকিস্তান-উত্তর কালে

অবশ্য দায়ে পড়ে পাজামা পরতেন। সু-ই পরতেন, স্যাণ্ডাল জনপ্রিয় ছিল সে যুগে, ক্বচিৎ পরেছেন পাম সু, ঘরে প্রায়ই পরতেন কুমিল্লাখ্যাত বোলের খড়ম, ক্বচিৎ বাইরে কোথাও যেতে ও থাকতে হলে সঙ্গে নিতেন চটি। চল্লিশের দশক থেকে তিনিও পরেছেন স্যাণ্ডাল।

থ. ঘরোয়া-জীবনে তাঁর সৌজন্যও ছিল অনন্য। কোনদিন কোন ব্যঞ্জন বিস্বাদ লাগলে, সেদিন তখনই তা বলতেন না, অন্যদিন সেই ব্যঞ্জনে যদি স্বাদ পেতেন, তা হলে পূর্বদিনে তা যে বিস্বাদ লেগেছিল, সে কথা ব্যক্ত করতেন। কোন খাদ্যবস্তু পিঠা কিংবা মিষ্টি বা আম-জাম-কাঁঠাল-তরমুজ-আপেল-আনারস দিলে খেতেন, কিন্তু কোনদিন চেয়ে খেতে দেখা যায়নি। যদিও তিনি বাজার থেকে যখন যে ফলের মৌসুম, তখন তা ক্রয় করে আনতেন, তাঁর পত্নীও ছিলেন ভোজনবিলাসী। তাঁর অতিথিপরায়ণতার কথা অনেকেই বলেছেন ও লিখেছেন নানা প্রসঙ্গে।

দ. আবদুল করিমের দেহাকৃতি ছিল একহারা মাঝারি, উচ্চতা ছিল পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি। গায়ের রঙ নির্দ্বিধায় গৌর বলা যাবে না বটে, তবে শ্যামলও নয়, ফর্সা কালোর মাঝামাঝি। চোখ ছিল উজ্জ্বল, দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। ১৯৩০ সনে অধিকাংশ দাঁত পড়ে যাওয়ায় কৃত্রিম দাঁত বাঁধানোর জন্যে চীনা দোকানে গিয়ে বাকি দাঁতগুলো উৎপাটন করান, ত্রিশটাকায় দু'পাটি দাঁত বাঁধানোর কথাও হয়, কিন্তু তিনি আর দাঁত গ্রহণ করেননি, ফলে তাঁর চেহারাই পালটে যায়। প্রৌঢ়বয়সে ১৯২৬-২৭ সনে শীতকালে তাঁর গুরুতর রোগ হয়, প্লীহা বাড়ে এবং কান ধরে যায়। ফলে তিনি কানে কম শুনতেন। আর আবার ১৯৪২ সনের ডিসেম্বরে রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪৩ সনের জানুয়ারি মাসেও ভোগেন।

ন. স্বদেশ ও বর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে স্বজাতি সম্বন্ধে তাঁর উদার অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছিল বলেই অপমান ও বিড়ম্বনা সহ্য করেও হিন্দুঘরের পুথি সংগ্রহ করেছেন। আবদুল করিম বলেছেন :

'হিন্দু বাড়ি গিয়া এমনও দেখিয়াছি– গোঁড়া হিন্দু আমাকে পুথি ছুঁইতে দেয় নাই– সে পাতা মেলিয়া ধরিয়াছে– আর আমি নোট লিখিয়া লইয়াছি।'

প্রাচীন পুথি সংগ্রহণে ও এর সংরক্ষণে সাহিত্যবিশারদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও একান্ত নিষ্ঠার বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্যোমকেশ মুস্তফী বলেন, '... তাঁহার গৃহে তাঁহার অদম্য উৎসাহ, যত্ন, চেষ্টা ও আগ্রহের ফলে আজ সহস্রাধিক প্রাচীন পুথি আসিয়া জমিয়াছে। ইহার জন্য তাঁহার অপরিমেয় শারীরিক পরিশ্রম ও আর্থিক ক্ষতিও হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা তাঁহাকে যে উৎপীড়ন সহিতে হইয়াছে, তাহা যেমন অদ্ভুত, তেমনি বিস্ময়কর। তিনি মুসলমান, কোন হিন্দুর আঙ্গিনায় তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু হিন্দুর ঘরে পুথি আছে শুনিয়া তিনি ভিখারীর মত তাঁহার দ্বারে গিয়া পুথি দেখিতে

চাহিয়াছেন। পুথি সরস্বতী পূজার দিন পূজিত হয়, অতএব মুসলমানকে ছুঁইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া, অনেকে তাঁহাকে দেখিতেও দেন নাই। অনেকে আবার তাঁহার কাকুতি-মিনতিতে নরম হইয়া নিজে পুথি খুলিয়া পাতা উল্টাইয়া দেখাইয়াছেন মুন্সী সাহেব দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া হস্তস্পর্শ না করিয়া কেবল চোখে দেখিয়া নোট করিয়া সেই সকল পুথির বিবরণ লিখিয়া আনিয়াছেন। এত অধ্যবসায়ে, এত আগ্রহে, এমন করিয়া কোন হিন্দু অন্ততঃ নিজের ঘরের পুথিগুলির বিবরণ লিখিতে বা অন্য কোন কার্যে হাত দিয়াছেন কিনা, জানি না।' [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যার ভূমিকা ১৩২০ সাল)

আবদুল করিম বলেছেন :

> 'আলোক আঁধারে এই সংসার। আমার সাহিত্যিক জীবনের অন্ধকার দিক আছে। মুসমানের ঘরে জন্মিয়া দেব ভাষা (সংস্কৃত) পড়িতে গিয়াছিলাম বলিয়া কৈশোরে একদিন হিন্দু সতীর্থদিগের কত টিটকারী আমাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। আজ আবার মনে পড়িতেছে, মুসলমান হইয়া হিন্দুর পুথি দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া কত হিন্দু ভ্রাতা তীব্র অবজ্ঞায় আমার প্রতি বঙ্কিম চাহনি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। খোদা'তালাকে ধন্যবাদ, তাহাদের সেই ঘৃণা ও শ্লেষ-দুষ্ট বক্র দৃষ্টিতে ব্যাহত না হইয়া আমার সাহিত্যানুরাগ বরং বাড়িয়াই চলিয়াছিল। তাহারই ফলে আজ আমার পর্ণকুটীর হিন্দু-মুসলমানের অতীত সাহিত্যসম্পদে পূর্ণ।' [বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৩০, ষষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা]

১৯৫৩ সনের ২৫শে মার্চ বুধবারে তাঁর পত্নী বদিউন্নিসার [১৮৭৩-১৯৫৩] মৃত্যু হয়। আর পত্নীবিয়োগের ছয় মাস পাঁচদিন পরে ১৯৫৩ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার সকাল সাড়ে দশটার সময়ে আবদুল করিমের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁর প্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুর দু ঘণ্টা পূর্বে পর্যন্ত তিনি পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত ও পরিবেশিত হয়েছিল ঢাকার সেকালের সব ইংরেজি বাঙলা-উর্দু দৈনিকে এবং সাপ্তাহিকে। কোলকাতার কাগজেও তাঁর মৃত্যুসংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আয়োজিত শোকসভায় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী প্রমুখ বিখ্যাত বিদ্বানেরা তাঁর গুণের ও অবদানের কথা বক্তৃতায় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদও শোকসভা করে। ঢাকায়-চট্টগ্রামে এবং অন্যত্রও অনেক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের, পটিয়ার স্থানীয় বিদ্যালয়গুলোও তাঁর মৃত্যু-সংবাদে ছুটি হয়ে যায়। 'আজাদ' পত্রিকা ঘটা করে তাঁর 'চেহ্লাম' উপলক্ষে সচিত্র বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত করে।

আবদুল করিমের জন্মশতবার্ষিকী ১৯৬৯ সনে (তখনো এইটিই তাঁর জন্ম সন বলে স্বীকৃত ছিল] নানাস্থানে পালিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান [এখন

বাঙলাদেশ] এবং বাঙলা একাডেমি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। বাঙলাদেশে রেডিয়ো কেন্দ্রগুলোতে প্রতিবছর ৩০শে সেপ্টেম্বর এক একটি 'কণিকা' মাধ্যমে তাঁকে দেশবাসীর পক্ষে স্মরণ করা হয়। চট্টগ্রামে 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মৃতি পরিষদ' নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। জয়তু আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।

তথ্যসূত্র :

১. জন্ম পত্রিকার চিত্র দ্রষ্টব্য।

২. জীবেন্দ্রকুমার দত্তের উক্তির উদ্ধৃতি এবং করিমের পত্রাংশ :

বিগত ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামে যে ভয়ানক লোকক্ষয়কারী মহাঝটিকা প্রবাহিত হয়, তাহাতে অপর সকলের ন্যায় মৌলবী সাহেবেরও প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়। তাঁহার পিতামহের শেষ জীবনে তাহাদের সামান্য জমিদারী ঋণজালে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত বাত্যাবর্তের অব্যাবহিত পরেই যমের দোসর মহাজনদের (!) উৎপাতরূপ ঝড়েও তাঁহাদের শান্তিময় সংসার নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এই দুর্দিনে আবার কিছু দিন মধ্যে তিনি কমিশনার অফিসের চাকরি হইতে বরখাস্ত হন। ফলে সমস্ত দুর্দৈব একত্রে আপতিত হইয়া তাঁহাদের পারিবারিক অবস্থা একান্ত শোচনীয় করিয়া তোলে। মামলা-মোকদ্দমা ও ঋণের দায়ে ক্ষুদ্র সম্পত্তি একরূপ ছারখারই হইয়া যায়। বর্তমানেও তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা সাধারণ দৃষ্টিতে নিতান্ত খারাপ না হইলেও, তাহাকে কখনও উন্নত বলা যায় না। সুবৃহৎ যৌথপরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য আজও তাহাদিগকে বাঙ্গালীর একমাত্র অন্তিম সম্বল 'চাকরির' ভাবনাই করিতে হয়। [জীবেন্দ্রকুমার দত্ত : ১৩১২ সালে 'কোহিনূরে' প্রকাশিত প্রবন্ধাংশ)।

উক্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তকে লিখিত আবদুল করিমের পত্রাংশ

"... এত অশান্তির মধ্যেও আমি সাহিত্য-সেবা করি কিরূপে? তাহার কারণ, আমার হাতে গৃহস্থালির কোন কাজের ভার রাখি নাই। সমস্ত আমার পিতৃব্যের হাতে দিয়া আমি নিশ্চিত আছি। সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে আবদ্ধ হইবার আমার ইচ্ছা নাই। সাহিত্য-ধন ভিন্ন অপর ধন আমার হইবার নহে, আমি চাইও না। এ সুখের ইংরেজ রাজত্বে সামান্য ২০ টাকার চাকরিতে ভরণ-পোষণই চলে না, তাহাতে আবার জায়গা জমিদারী যোগাইবার ইচ্ছা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমার জীবনযাত্রার অবশিষ্ট পথটুকু এরূপ নির্বিঘ্নেই যেন আমাকে চলিতে দেন। স্বদেশ ও মাতৃভূমির প্রাচীন পুণ্যময়ী গাথা গাহিতে গাহিতে আমার এ তুচ্ছ জীবন অতিবাহিত হইয়া যাউক, ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিবেন।"

'এই গাথা গাহিতে গাহিতে'ই আবদুল করিম ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর [তথা ১৩৬০ সনের ১৩ই আশ্বিন বুধবারে] ইহধাম ত্যাগ করেন।

[পুঁথি পরিচিতি, মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : মোহাম্মদ ইদরিস আলী, পৃ. ছ]

৩. বড়তুফানের কবিতা, পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৩৬৭-৬৮, ১৯৫৮

৪. ২য় সংখ্যক তথ্য দ্রষ্টব্য।

৫. আবদুল করিমের ইংরেজি হস্তাক্ষর-চিত্র দ্রষ্টব্য।

৬. বিজ্ঞাপন ও জীবেন্দ্রকুমারের এ বিষয়ক মন্তব্য :

প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহের জন্যে মৌলবী সাহেব 'জ্যোতিঃ'-তে একখানি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। তাহার কিয়দংশ এইরূপ :

"প্রাচীন গীত, পুঁথি, বারমাস প্রভৃতি সংগ্রহের যিনি সংগ্রহ করিয়া দিবেন, তাঁহাকে আমরা এক বৎসর কাল 'জ্যোতিঃ' বিনামূল্যে দান করিব।" বলা বাহুল্য, উক্ত সংগ্রহের কার্যে 'জ্যোতিঃ' সম্পাদক মহাশয়েরও সহানুভূতি ছিল, তিনি মৌলবী সাহেবের অনুরোধেই 'জ্যোতিঃ' বিনামূল্যে দিতে স্বীকৃত হন। এই বিজ্ঞাপন একদিন এমন সর্বনাশ উপস্থিত করিবে জানিলে তাহা সম্পাদক মহাশয়ের নামেই দেওয়া যাইতে পারিত। নবীন বাবুর শত্রুপক্ষীয়েরা এই বিজ্ঞাপনস্থ "আমরা এক বৎসরকাল 'জ্যোতিঃ' বিনামূল্যে দান করিব," এই কথাগুলি দ্বারাই 'জ্যোতিঃ'র সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে বলিয়া মিঃ ম্যানেস্টি বাহাদুরকে বুঝাইয়া দেন। সত্য কথা বলিতে গেলে, 'জ্যোতিঃ'র সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ ছিল না এবং কোন গুপ্ত সংবাদও তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। সে সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। এখানে বলিবার স্থান নাই।" [কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯) রচিত 'আমার জীবন' ৫ম খণ্ডে এর বিস্তৃত বিবরণ হয়েছে।]

ফলতঃ এই সকল অমঙ্গলজনক অনর্থরাশির বশবর্তী থাকিয়াও মৌলবী সাহেব কিরূপে বাঙ্গালা লেখকরূপে পরিণত হইলেন, তাহাই একান্ত ভাবনা ও বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক, উক্তরূপ ভাগ্য-বিড়ম্বনার পরে তাঁহার অকৃত্রিম হিতৈষী কবিবর নবীনবাবুর পরামর্শে তিনি অর্থ চেষ্টায় রেঙ্গুন যাইতে সঙ্কল্প করেন। তথায় গেলে সম্ভবতঃ তাঁহার সংসারভাগ্য সুপ্রসন্নই হইয়া উঠিত। কিন্তু স্নেহময়ী জননী সদৃশী মাতৃভূমির পুণ্য অঙ্ক ছাড়িয়া যাইতে মাতৃভক্ত আবদুল করিম ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; এমন সময় আনোয়ারা মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় তিনি সামান্য বেতনে তাহাতেই নিযুক্ত হইয়া গেলেন। [স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ২৬-২৭]

৭. খান বাহাদুর আবদুল আজিজ, স্পেশিয়াল অফিসার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়–তাঁর চিঠি দ্র.।

'রাজা' খ্যাতি সাহিত্যবিশারদ-স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯। মাহবুব-উল আলমের প্রবন্ধ, পৃ. ৩৪।

৮. পরিষৎ পরিচয় : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৯৬। সে-বছর সভাপতি ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

৯. বিস্তৃতবিবরণ, ২৮শে আগস্ট, শুক্রবার, ১৯৮১-র সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত সঞ্জীবপ্রসাদ সেনের পত্রে দ্রষ্টব্য।

১০. সাহিত্যবিশারদের হস্তাক্ষর দ্রষ্টব্য।

১০ক. বিস্তৃত বিবরণ মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহারের প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য, স্মারকগ্রন্থ পৃ. ৪৬।
'ময়নামতীর গান' নামে যে পুঁথি এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পরীক্ষায় পাঠ্য হয়েছে, তা মূলতঃ করিম সাহেবেরই সম্পাদিত পুঁথি। ত্রিপুরা জেলা থেকে এই বই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করার জন্য তিনি এ পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন। এর কিছু পরেই দীনেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে প্রকাশ করার জন্য এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি ও মূল পুঁথি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেন। দীনেশবাবু লিখেছিলেন, "It will be a work of joint editorship". সাহিত্যবিশারদ ভেবেছিলেন তাঁকেও এ বই-এর একজন editor করা হবে। বই যখন প্রকাশিত হল, তখন দেখা গেল বইখানি বেরিয়েছে দীনেশচন্দ্র, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বি-এ ও বসন্তরঞ্জন রায়–এই তিন জনের নামে। সাহিত্যবিশারদের পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি থেকে বিস্তর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে বলে তাঁকে দেওয়া হয়েছে ধন্যবাদ। এ সম্পর্কে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁর 'শুকুর মামুদের ময়নামতীর গান' পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
সবচেয়ে মজার কাণ্ড করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়। সাহিত্যবিশারদ 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকায় 'বঙ্গ-সাহিত্যে পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর' নামে প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। সেই প্রবন্ধ বিদ্যানিধি মহাশয় 'প্রদীপ' কাগজে নিজের নামে ছেপেছেন। 'সুধাকর' ও 'নবনূর' কাগজে এ সম্পর্কে যখন প্রতিবাদ করা হয়, চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়।

১১. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান, আল্ ইসলাম, ১৩২৫ সাল মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং আরো কেউ কেউ তীব্রভাষায় লিখিতভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন।

১২. ১৯৪৭ সনে নভেম্বরে বিশজনের সই করা স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দেয়া হয়।– ভাষা আন্দোলনের কিছু অজানা কথা : 'বিশজনের স্মারকলিপি'–অনুপম হায়াৎ; ১৬.০২.৮০, 'সচিত্র বাংলাদেশ'।

১৩. অভিভাষণে ও ১৯১৮ সনের নভেম্বরে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ, ১৩২৫ সাল।

১৪. পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান ১৩৫৪ সালের কোন সাপ্তাহিক সাহিত্য সংখ্যা।

* [২০১২ সালে আগামী প্রকাশনী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. আহমদ শরীফ রচিত 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ' গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ (পৃ. ০৭-২৩) পণ্ডিত আহমদ শরীফের (১৯২১-১৯৯৯) প্রতি জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে প্রকাশিত হলো।-সম্পাদকদ্বয়]